অধ্যাপক আব্দুল-াহ আবু সায়ীদের সঙ্গে আলাপচারিতা

মোঃ জাফরউল-াহ্

অধ্যাপক আব্দুল-াহ আবু সায়ীদকে পড়শীর পাঠকদের কাছে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার অবকাশ নেই। ঢাকা কলেজের 'সায়ীদ স্যার' হিসেবেই পরিচিত অধিকাংশের কাছে - এমনকি যারা ঢাকা কলেজে কোনদিন পড়েননি তারাও গল্পের যাদুকর এই মানুষটিকে ঐ নামে চেনে। সত্তর দশকে 'সপ্তবর্ণা' নামের একটি রুচিশীল টিভি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান তাকে এনে দিয়েছিল কিংবদন্তীসম জনপ্রিয়তা। সেই জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে তিনি পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠা করেন বইপড়াকেন্দ্রিক এক ব্যতিক্রমী প্রতিষ্ঠান 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র'। এই প্রতিষ্ঠানের শাখা আজ ছড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল ছাড়িয়ে প্রবাসে এই উত্তর আমেরিকাতেও। অধ্যাপক সায়ীদ অধুনা নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন বাংলাদেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ আন্দোলনে। সম্প্রতি এই গুণী মানুষটি বে এরিয়াতে এসেছিলেন স্থানীয় বাংলাদেশ সমিতির আমন্ত্রণে। সেই সময় পড়শী'র নানা প্রশ্নের জবাব দেন অধ্যাপক আব্দুল-াহ আবু সায়ীদ । তার একান্ত সাক্ষাৎকারটি এখানে প্রকাশিত হলো।

প্রশ্ন : এ যাত্রায় আপনার আমেরিকাতে আসবার মূল কারণগুলো কি?

উত্তর : এবার মূল কারণ হচ্ছে যে, বাংলাদেশের বাইরে বেশ কিছু বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের শাখা গড়ে উঠছে। যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা আমাদের কেন্দ্রের সাথে কোন না কোন ভাবে জড়িত ছিল বা যারা মনের দিক থেকে এর কাছাকাছি ছিল তারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় শাখা গড়ে তুলছে। যেমন - লন্ডনে, নিউইয়র্কে বড় শাখা গড়ে উঠেছে। টরেন্টোতে একটা হতে যাচ্ছে। এ সমস্ত শাখাগুলো একটু দেখে যাওয়া এবং যে সমস্ত আইনগত ভিত্তিতে আমাদের শাখা তৈরি হওয়া উচিত সেগুলোকে একটু ঠিক করা। তার সাথে লসএঞ্জেলসে নজরুল সম্মে লনে একটা নিমন্ত্রণ ছিল।

প্রশ্ন : প্রবাসী বাংলাদেশীদের সাথে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর মিল ও অমিল কোথায়?

উত্তর : প্রবাসে বাংলাদেশী এবং আমাদের বাংলাদেশী এই দুয়ের মধ্যে আমি কোন পার্থক্য দেখি না। দেখি না এই জন্য যে আমার ধারণা শৈশব হচ্ছে আমাদের জীবনের সেই সময় যখন আমরা সারা পৃথিবী থেকে আহরণ করি। আমাদের অনুভূতি, স্বপ্ন, মূল্যবোধ, ভালবাসা আমাদের চার পাশের প্রকৃতি, আকাশ, মাটি সবকিছুকে আমরা আমাদের মাঝে গ্রহণ করি। আজকের প্রবাসী বাংলাদেশী তাদের প্রায় সবারই জীবনের প্রথমাংশ কেটেছে বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের যারা তাদেরও জীবন ওখানে কেটেছে। তাই তাদের মধ্যে আমি ঠিক কোন পার্থক্য দেখি না তবে একটা জিনিস, দূরে থাকাতে প্রেম কিছুটা বাড়ে। একজন জেলখানার কয়েদীর যেমন বাইরে মুক্ত জীবনকে অসম্ভব রোমান্টিক মনে হয়, খুব সুন্দর মনে হয়, নষ্টালজিয়াতে ভোগে তেমিনভাবে আমার মনে হয় বাইরের বাংলাদেশীরা আমাদের চাইতেও বেশি বাংলাদেশী। ছেলেমেয়েদের বাবা-মারা যতখানি ভালবাসে, দাদা-দাদিরা তার চাইতেও বেশি ভালবাসতে পারে কারণ দাদা দাদিদের সেখানে দায়িত্ব কম। সেজন্য বলা হয় আসলের চাইতে সুদ বড় হয়ে যায়। তেমনি যারা বাংলাদেশের বাইরে আছে তারা দেশের রিয়ালিটির মধ্যে নেই বলে, যন্ত্রণাগুলোর মধ্যে নেই বলে দূরে থেকে দেশের স্বপ্নগুলো অনেক সজীব, জীবন্ত এবং আনন্দময় হয়ে ওঠে। দেশের প্রতি ভালবাসা ও উৎকণ্ঠা তাদের মধ্যে খুব প্রচণ্ডভাবে কাজ করে।

প্রশ্ন : সাম্প্রতিক নিউইয়র্কে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে আপনি বলেছেন, শেখ মুজিব, কবি নজরুল ইসলাম কিংবা কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জাগরণ ও তেজোদ্দীপনা সাধারণ বাঙালীর জীবন চেতানার সাথে বিপরীতধর্মী। একটু ব্যাখ্যা করবেন!

উত্তর : এটা আমি নিজেও একটা বইয়ের মধ্যে লিখেছি। আমার কেন জানি মনে হয় যে একটা জাতির যারা প্রতিভাবান মানুষ তারা সেই জাতির যে গড়পড়তা মানুষ তাদের প্রতিবাদ করে জন্মগ্রহণ করে। যেমন আরবের এরকম একটা ভয়ঙ্কর বেদুইনদের মাঝে হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর মত একজন প্রেমময় মানুষ কি করে জন্মালেন। আমাদের সেই সীমান্তের আবদুল গাফফার খান সীমান্ত প্রদেশে সেই বন্দুকধারী মানুষের মধ্যে কি করে জন্মালেন। আর আমাদের বাঙালীদের মধ্যে যে অসহায়তা, অক্ষমতা, সেখানে বিদ্যাসাগরের মত মানুষ কি করে জন্মালেন। সেখানে প্রত্যেকটা বাঙালীর কাজ হচ্ছে হিসাব করে গুনে গুনে চলা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব। সেই জীবের মধ্যে মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুভাষ, শেখ মুজিবের মত শক্তিমান মানুষগুলো কি করে এলো, এসব থেকে আমার মনে হয়েছে সম্ভবত একটা জাতির প্রতিভাবান মানুষেরা সেই জাতির প্রিয় এবং প্রতিপক্ষ। প্রিয়, কারণ তারা জাতির কল্যাণের জন্য জন্মায়; কিন্তু তারা যে শক্তি নিয়ে জন্মায় সেটা ওই জাতির বিরুদ্ধ শক্তি।

প্রশ্ন : পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য এ দুটো আন্দোলনেই বাংলাদেশে আপনি অগ্রণী ভুমিকা রাখছেন। আপনার বিচারে এ দুটো ব্যাপারে জাতিসংঘের মানদন্ডে বাংলাদেশের অবস্থান কোথায়? মুক্তির কিংবা উন্নয়নের সম্ভাবনা কতটুকু?

উত্তর : পরিবেশ আন্দোলন বাংলাদেশে অত্যন্ত জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের পরিবেশ নানার কারণে বিপন্ন। বাংলাদেশে যে জনসংখ্যা এটাই একটা সুস্থ পরিবেশ বিরোধী। শ্বাসরুদ্ধকর একটা পরিবেশের মধ্যে সারাদেশকে বাঁচতে হচ্ছে। অত্যন্ত সামান্য সম্পদের উপর অসংখ্য মানুষের চাপ এসে পড়ছে। বাংলাদেশ একটা অসহনীয় জায়গাতে পরিণত হচ্ছে আর তার সাথে যেটা হচ্ছে গত পঞ্চাশ বছরে দেশে একটা বৈষয়িক, বিত্ত বৈভবের বিকাশ ঘটেছে। তারপরে কলকারখানা হয়েছে, যানবাহন এসেছে, আধুনিকতা এসেছে, সাথে শিল্প বর্জ্য এসেছে, পলিথিন এসেছে। এসমস্ত অসংখ্য জিনিস এসে আমাদের বুকের উপর দানবের মত চেপে বসেছে। সুতরাং আমাদের প্রধান আন্দোলন হওয়া উচিত একটা সুস্থ জীবন ফিরিয়ে আনা। এই যান্ত্রিকতার চাপে আমাদের যে সুন্দর জীবন এক সময় ছিল, প্রকৃতির কাছাকাছি যে জীবনটা ছিল, সেই জীবনকে আমরা হারিয়ে বসেছি। আমাদের এখন উচিত হবে প্রকৃতির কাছেই আবার ফিরে যাওয়া। এটা সারা পৃথিবী চেষ্টা করছে কারণ এক সময় মানুষ প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করেছে, প্রকৃতির উপর বিজয়ী হবার চেষ্টা করেছে। শত্রুর সাথে যেভাবে মানুষ যুদ্ধ করে, যেভাবে তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে, তছনছ করে, সেভাবে মানুষ প্রকৃতিকে তছনছ করেছে, ছিন্নভিন্ন করেছে। সেটা করে আজকে মানুষ বুঝতে পেরেছে প্রকৃতির সাথে মানুষ সহাবস্থান করতে পারে, তাকে ধ্বংস করতে পারে না, কারণ সে নিজেও প্রকৃতির অংশ। প্রকৃতি মরে গেলে সে নিজেও মরে যায়। সন্তানের স্বাস্থ্যের ভালোর জন্য যেমন মায়ের স্বাস্থ্য ভালো হওয়া দরকার তেমনি মানব জাতির স্বাস্থ্যের জন্য আমাদেরকে প্রকৃতি ও পরিবেশকে সুন্দর রাখতে হবে। সেজন্যই আমাদের পরিবেশ আন্দোলন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

স্বাস্থ্যের কথা যেটা আমার মনে হয়, আমাদের জাতির সবচেয়ে দুর্বল জায়গা হচ্ছে স্বাস্থ্যহীনতা। আমাদের মেধার কোন কমতি নেই, আমাদের বুদ্ধি কল্পনা শক্তির কোন কমতি নেই, কিন্তু একটা জায়গায় আমরা খুব দুর্বল। এই স্বাস্থ্য না থাকার জন্য আমরা মানুষ হিসেবে, জাতি হিসেবে অনেক নেতিবাচক হয়ে পড়েছি। স্বাস্থ্যের অভাবে আমরা সংগঠন গড়ে তুলতে

পারিনি, সংগঠন গড়ে তুলতে পারিনি বলে অতীতে আমরা বিদেশীদের পদানত হয়ে গেছি। হয়ত পদানত হয়ে গেছি বলে আমরা আর সংগঠন গড়েই তুলতে পারিনি। অথচ একটা জাতির মূল শক্তিই হচ্ছে তার সাংগঠনিক শক্তি। আজকে আমেরিকা এত শক্তিশালী। এটা ব্যক্তির জন্য নয় অসংখ্য সংগঠন সুন্দরভাবে সুপরিচালিত হচ্ছে বলে আজকে এ জাতিকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। আরো বহু কারণে সংগঠন গড়ে উঠেনি - স্বাস্থ্যকে আমার একটা বড় কারণ মনে হয়। স্বাস্থ্য আন্দোলন আমাদের দেশে খুবই জরুরী। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নামে আমাদের দেশে একটা মন্ত্রণালয় আছে, কিন্তু তার প্রধান কাজ হচ্ছে ডাক্তার, হাসপাতাল, ওষুধ ইনজেকশন রুগী। আমার মনে হয় ওটার নাম হওয়া উচিত রোগ মন্ত্রণালয়, যদি সম্মান করে বলতে হয় তাহলে বলতে হয় আরোগ্য মন্ত্রণালয়। এটা দিয়ে স্বাস্থের উন্নতি হবে না আমাদের। আমি সুমু পালোয়ান হবার কথা বলছি না। কিন্তু একটা বেঁচে থাকার আর সংগ্রাম চালিয়ে যাবার মত একটা সুস্থ শরীর আমাদের দরকার। আমরা এ আন্দোলনটা গড়ে তোলার চেষ্টা করছি।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রবাসীদের সমষ্ঠিগতভাবে অবদান রাখার সুযোগ কতটুকু?

উত্তর : সুযোগের থেকে যেটা বেশী দরকার একটা কথা মনে রাখা প্রবাসী বাংলাদেশীদের এটা দায়িত্ব। জাতির কাছে তাদের একটা ঋণ আছে । আজকে যে ছেলে মেয়েটা এখানে জন্মাচ্ছে তার বেলায় এটা প্রয়োজ্য নয়। কিন্তু যারা বাংলাদেশে জন্মেছে, জাতির অর্থে লালিত পালিত হয়েছে, বাংলার আকাশ মাটিতে যাদের স্বপ্নগুলো বড় হয়েছে তাদেরতো এখন ফেরত দিতে হবে। আমি মনে করি যে কোন ঋণেরই মূল্য দেওয়া উচিত। তাহলে পরে সে দায়মুক্ত হয়। তা না হলে তার মধ্যে একটা দূর্বল জায়গা চিরকালই থেকে যাবে। প্রবাসী বাংলাদেশীদের জাতির কাছে যে ঋণ আছে সেটা যতটা সম্ভব তাদের ফেরত দেওয়া উচিত। তাদের একটা বড় দায়িত্ব রয়েছে।

প্রশ্ন : প্রবাসে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা কর্মকান্ডের জন্য প্রবাসীদের কি করা উচিত?

উত্তর : এখানে একটা সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে তোলা উচিত। বাঙালী সংস্কৃতিকে এখানে সঞ্জীবিত রাখা উচিত। প্রবাসীদের পৃথিবীর দর্শন বিজ্ঞান পঠন পাঠনের মধ্যে দিয়ে একটা সুন্দর বাঙালী হওয়া উচিত। এটা হলে এই উদ্যোগটা আরো শক্তি পাবে। টিউবওয়েল না থাকলে যেমন পানি উঠে না তেমনি এখানে নিরন্তর একটা সংস্কৃতির মেধা মননের চর্চা করার মত যদি একটা গোষ্ঠী গড়ে না উঠে তাহলে পরে এটা আস্তে আস্তে দূর্বল হয়ে যাবে। অন্যদের উপর নির্ভর করতে হবে - বাংলাদেশের লেখকের উপর নির্ভর করতে হবে। এটা ঠিক নয়। প্রবাসে এখন এত মেধাবী মানুষ আছে যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মত ঘটনা বা সাংস্কৃতিক গতিশীলতা সপ্রাণ হয়ে থাকতে পারে। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে - বাংলাদেশ একটা দরিদ্রতম দেশ কিন্তু বাঙালী সংস্কৃতি কিন্তু দরিদ্রতম নয়। সারা বিশ্বের সাথে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে বাঙালী সংস্কৃতি কিন্তু খুবই উঁচুতে। যেমন আমেরিকা এত বড় দেশ কিন্তু আমেরিকা রবীন্দ্রনাথের মত একটা মানুষ উপহার দিতে পারেনি আজ পর্যন্ত। অর্থ ও সংস্কৃতি এক সূত্রে বাঁধা নয়। আমাদের একটা বড় ঐতিহ্য আছে, বড় সংস্কৃতি আছে, ধর্মনিরপেক্ষতা আছে। আমাদের এই সংস্কৃতি সারা পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রাখা উচিত। আরেকটা কথা মাইনরিটির কখনো ন্যাশনালিটি হয় না। সেই জন্য আমদের যে উৎস সেই উৎসের সংস্কৃতির সাথে আমাদের উচিত নিজেকে বহমান রেখে দেওয়া। তা না হলে প্রচন্ড আইডেনটিটি ক্রাইসিস হয়ে যেতে পারে।

প্রশ্ন : জনশ্রুতি আছে ঢাকা কলেজে আপনার দীর্ঘ শিক্ষকতার জীবনে আপনি একটি কবিতা কিংবা গল্প নিয়েই সারা বছর কাটাতেন অথচ ক্লাসে বসার জায়গা হতো না। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আপনার এ পদ্ধতি কতটা যুক্তিগ্রাহ্য?

উত্তর : প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশে যদি উন্নত হত তাহলে আমি এ কাজ করতাম না। কিন্তু এই শিক্ষা ব্যবস্থা এতই নিম্নমানের - সেখানে শুধু আছে নোট, শুধু আছে মুখস্ত, শুধু আছে পরীক্ষার হলে গিয়ে বমি করে দেওয়া সেগুলো। আছে কোচিং সেন্টার, আছে প্রাইভেট টিউশনি। সেখানে একটা মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের কোন জায়গা নেই। সেজন্য আমার ক্লাসগুলোকে আমি আনন্দময় ও কল্পনা সমৃদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করতাম। এটা করতাম ছাত্রদের উপকারের জন্য। আমি আমার ছাত্রদের বলতাম তুমি আমার কাছ থেকে সেটুকু শুন যেটা তুমি তোমার বইয়ে পাবে না। আমি তোমাদের একটা বড় জীবনের জন্য ডাক দিতে চাই। একজন শিক্ষক হচ্ছেন একজন মোয়াজ্জিন। শিক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে ঘুম ভাঙানোর দায়িত্ব। আমিতো কিছুই পাঠ্যপুস্তক পড়াইনি, তারপরও ছাত্ররা আমাকে মনে রেখেছে। আমি চেষ্টা করেছি সাহিত্যের প্রতি ছাত্রদের ভালবাসা আর স্বপ্ন জাগিয়ে তোলার।

প্রশ্ন : সঙ্গত কারণেই বিটিভির পর্দায় আপনি অর্জন করেছিলেন আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা। এই ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য আন্দোলনে কতটা সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে?

উত্তর : আমি যদি টেলিভিশনে না থাকতাম তাহলে আমি কিছুই করতে পারতাম না। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র করতে পেরেছি তার কারণ আমি তখন টেলিভিশনে সুপরিচিত ছিলাম। সকলের দরজা আমার জন্য খোলা ছিল। বড়লোকরা আমাকে টাকা দিয়েছে, দেশের আমলারা আমাকে সাহায্য সহযোগিতা করেছে। আমরাই একমাত্র সংগঠন বাংলাদেশে যেটা দেশের টাকা দিয়ে তৈরী হয়েছে। একটা মাত্র প্রকল্প এতদিন পরে এসে বিদেশের সাহায্য নিলাম সেটা হচ্ছে ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী। এটার খরচ সাত কোটি টাকা। দেশ থেকে পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। আমি যদি একজন বুদ্ধিজীবী হতাম তাহলে এ কাজ আমি কিছুতেই করতে পারতাম না। নিজেকে পরিচিত করতে করতেই আমার জীবন কেটে যেত। টেলিভিশনের সুপরিচিতি আমাকে ভীষণ সাহায্য করেছে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র করার ব্যাপারে।

প্রশ্ন : একজন ব্যক্তি হিসেবে আপনার সবচেয়ে বড় অর্জন কি? এমন কিছু কি আছে যা না পেয়ে মনকষ্টে ভুগছেন?

উত্তর : আমার অর্জনের কোন বাসনা নেই। আমার বাসনা একটাই সেটা হচ্ছে আনন্দ। কারণ এ জীবন আমি অর্জন করলেও চলে যাবে, অর্জন না করলেও চলে যাবে। সুতরাং একটা জিনিসই এ জীবনে সবচেয়ে সুন্দর সেটা যে আমার জীবনে প্রত্যেকটা মুহূর্তকে যদি আমি খুশীতে, আনন্দে ভরে তুলতে পারি। সেটাই হচ্ছে এ জীবনে পরিপূর্ণ ব্যবহার সর্বোচ্চ ব্যবহার। একটা ঘটনা বলি, আমার এক স্যারের সাথে দেখা। উনি জিজ্ঞাসা করলেন কেমন আছ? উত্তরে বললাম, ভালই, কিন্তু খাটতে খাটতে বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।' তখন বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের প্রথম দিকের কথা। তখন উনি একটা আশ্চর্য কথা বললেন। উনি বললেন, এমনি ও বৃদ্ধ হতে। মাঝখানে কাজটা লাভ হয়ে গেছে। আমি মনে করি জীবনে সাফল্য আর স্বার্থকতা এক কথা নয়। সফল মানুষ জীবনে অনেকভাবে হতে পারে। স্বার্থকতা মানে আমার মধ্যে যে ক্ষমতাগুলো ছিল - তার পরিপূর্ণ সুব্যবহারের নাম স্বার্থকতা। আমি সেই দিকেই চেষ্টা করেছি আর আনন্দের মধ্যে থেকেছি। আমার যদি কিছু অর্জন থাকে সেটা সেই আনন্দই।

প্রশ্ন : পড়শী পরিবারের জন্য আপনার বিশেষ কোন বক্তব্য থাকলে বলবেন কি?

উত্তর : পড়শী দেখে আমি এমনিতেই অবাক হয়ে গেছি। এদেশে এখানে একটা সিরিয়াস পত্রিকা কি করে চলছে? আমার বিশ্বাস তারা নিজেরাই তাদের পথ খুঁজে নিতে পারবে। মানুষ কেউ কাউকে উপদেশ দিয়ে পথ নির্দেশ করতে পারে না। যে শক্তি মানুষের নিজের মধ্যে আছে সেটা দিয়ে সে তার পথ তৈরী করে নেয়। সেই শক্তি দিয়ে যখন এতদূর এসেছে আমি বিশ্বাস করি সেই শক্তি আরো বলীয়ান হবে। ভবিষ্যতে এই বিশ্বাস থেকে এই আকাঙ্খা থেকে অনেক বড় পত্রিকা হয়ে যাবে পড়শী। ❑

স্যান হোজে

জুন ২, ২০০২।